রজনীকান্ত সেন বাংলা গানের কিংবদন্তী

আসাদুল হক

১৯০৫ সালের কথা। বৃটিশ শাসকরা যখন বুঝতে পারলো বাঙালির চিত্ত-চেতনায় স্বদেশ ভাবনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে 'বঙ্গভঙ্গ' করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে লাগলো। লর্ড কার্জন তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। এই হীনপ্রচেষ্টা যাতে সফল না হয় তার জন্য রুখে দাঁড়াতে শীর্ষস্থানীয় বাঙালিরা একত্রিত হতে লাগল। কিন্তু ফল হয় না। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২) বঙ্গদেশকে দু'ভাগে ভাগ করা হলো। পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ এবং প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নতুন নামকরণ করা হলো। বিহার প্রদেশকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে এবং অসম প্রদেশকে পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত করা হলো। শুধু তাই নয় দুই প্রদেশের দু'জন শাসনকর্তা এবং রাজ্য শাসনের জন্য নতুন নতুন আইন কানুনের ব্যবস্থা করা হলো। বাঙালিরা এই নতুন বিধি ব্যবস্থার প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। বাঙালির ঘরে ঘরে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হলো।

কবি, লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মীসহ চিন্তাশীল ব্যক্তি যারা ঘরে বসে তাঁদের শিল্পকর্ম করেন তারা ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন প্রতিরোধ করার জন্য। গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, এদের সাথে যোগদান করলেন রবীন্দ্রনাথ। সবার সাথে গঙ্গায় স্নান করে নগ্ন পায়ে চলতে চলতে সবার হাতে হলুদ সুতোর রাখী বাঁধতে লাগলেন। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান বর্জন করে। এখানে হিন্দু-মুসলমান সবার হাতেই রাখীবন্ধন করতে লাগলেন। অন্তর বেদনায় সবার সাথে এক সুরে গেয়ে উঠলেন বঙ্গজননীর পদবন্দনা। বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য, প্রার্থনার ঢঙে। রবীন্দ্রনাথের সাথে কন্ঠ মেলালেন-

বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু

বাংলার ফল

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার পণ বাঙালির আশা

বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান

বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন

বাঙালির ঘরে ঘরে যত ভাই বোন

এক হউক (৩) হে ভগবান।

জানা যায়, এ সংবাদে অতুল প্রসাদ লাখনৌ থেকে ছুটে এলেন কলকাতা। তিনিও এই পদযাত্রায় যোগদান করলেন। হাওড়া স্টেশনে নেমেই কলকাতার পথে শুনতে পেলেন তারই রচিত গান গেয়ে জনতা এগিয়ে চলেছে, তিনিও কন্ঠ মেলালেন তাঁর নিজের রচিত গানে-

দেখ মা এবার দুয়ার খুলে
গলে গলে এনু মা তোর
হিন্দু মুসলমান দু'ছেলে ।।
এসেছি মা শপথ করে

ঘরের বিধান মিটবে ঘরে
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে ।।

বিদেশী মিহি সুতার কাপড় বর্জন করে স্বদেশী মোটা তাঁতের কাপড় এমনকি বিদেশী সমস্ত জিনিস বর্জন করার এক শপথ নেওয়ার জন্য চারদিক থেকে সোচ্চার আহবান ধ্বনিত হতে লাগল। ঠিক এই সময় রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) তার মন-প্রাণ ঢেলে গেয়ে উঠলেন-

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নেই ।।

খালি গায়ে কাঁধে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে দু'একজনকে সাথে করে রজনীকান্ত রাস্তায় নেমে এলো তার সদ্য রচিত গান নিয়ে। বাঙালির মনে নতুন জোয়ার বইতে লাগলো। দেখতে দেখতে কাতারে কাতারে ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ, বুদ্ধিজীবী সবাই ঘর ছেড়ে পথে এসে যোগ দেয় রজনীকান্তের নতুন গানে সুর মেলাতে।

আমার আজকের প্রয়াস কান্তকবি রজনীকান্ত সেনকে নিয়ে কিছু কথা বলার। তাই তার বাল্যকাল থেকে ক্রমবর্ধমান জীবনের কিছুটা সময় তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছি। রজনীকান্ত সেন ২৬শে জুলাই, ১৮৬৫ সনে, বাংলা ১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণে বুধবার ভোররাতে অধুনা সিরাজগঞ্জ জেলার ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভাঙাবাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার উলস্নাপাড়া থানাধীন একটি অনুন্নত ছোট্ট গ্রাম। জানা যায়, অনেক আগে এই গ্রামে অসংখ্য নলবন ও পানের বরজ ছিল। ময়মনসিংহের সহদেবপুর গ্রাম থেকে রাজা রাম সেন ও রাজেন্দ্ররাম সেন দুই ভাই এই গ্রামে এসে বসবাস শুরম্ন করেন। এদের আগমনের আগে এখানে কোন ভাল বংশজাত হিন্দুর বসবাস ছিল না। ঐ সময় ভাঙাবাড়ির চারপাশে প্রকাণ্ড বিল ছিল। কালক্রমে এই বিল শুকিয়ে মনুষ্য বসবাসের যোগ্য হয়। ভাঙাবাড়ি গ্রামটি ছিল উত্তরে ও দড়্গিণে বিস্তৃত। এ গ্রামের উত্তর ও পশ্চিমে দেলুয়াকান্দি, দড়্গিণে চন্দনগাতি এবং পুবে কোনাবাড়ি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের পাশ দিয়ে যমুনা নদীর শাখা 'হুরা সাগর' নামক একটি নদী প্রবাহিত। সেন পরিবারের বসবাসের ফলে গ্রামটিরও ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধিত হয়।

এই সেন পরিবারের আগমনের ফলে এবং গ্রামের উন্নয়নের সাথে সাথে আশেপাশের গ্রাম থেকে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আগমনে গ্রামটি উন্নত হতে থাকে। আরো জানা যায়, রজনীকান্ত যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন শুধু হিন্দু নয় চলিস্নশ ঘরের উপরে মুসলমানও ভাঙাবাড়িতে বসবাস করতো। গ্রামটির নানাভাবে উন্নতি হলেও সেখানে কোন পোস্ট অফিস ছিল না। রজনীকান্তর চেষ্টার ফলে তাদেরই বাইরের একটি ঘরে প্রথম পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় গ্রামে একটি বিদ্যালয় ছিল। রাস্তা তৈরি হওয়ায় স্কুল ও অন্য সব কিছুরই উন্নতি হতে থাকে।

রজনীকান্ত যখন জন্মগ্রহণ করেন তার ভাঙাবাড়ি পিত্রালয়ে তখন তার পিতা গুরম্ন প্রসাদ সেন কটোয়ার মুনসেফ ছিলেন। বাবা সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা হবার কারণে রজনীকান্ত শৈশবকাল থেকেই পিতার সাথে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। রজনীকান্ত শৈশবেই খুব প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে নদীয়া নবদ্বীপের ভাষা রপ্ত করে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে শেখেন। যখনই রজনীকান্ত পিতার সাথে ভাঙাবাড়ি আসতেন তখনই গ্রামের নারী-পুরম্নষদের ভিড় জমে যেত এই

প্রিয়দর্শন কিশোরের মুখে আধো উচ্চারিত নবদ্বীপের সুন্দর বাংলা ভাষা শোনার জন্য। এখানে উলেস্নখ করা যায়, রজনীকান্থর উত্তর জীবনের সংগীতপ্রিয়তা, আবৃত্তি পটুতা এবং রহস্যাভিনয় দড়্গতার পরিচয় তার শৈশবকাল থেকেই অঙ্কুরিত হয়। বাল্যকাল থেকেই গান শুনতে ভালোবাসতেন এবং কয়েকবার শুনেই মুখস্থ করতে পারতেন।

ঘরেই রজনীকান্থর পড়াশোনায় হাতেখড়ি। পরে তিনি রাজশাহী গিয়ে বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে (পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল) ভর্তি হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শুরম্ন করেন। কিন্তু রজনীকান্থ পড়াশোনার চাইতে খেলাধুলা, ঘুড়ি উড়ানো, নদীতে মাছ ধরায় সময় কাটাতেন বেশী। গাছে চড়ে ফল পেড়ে খাওয়াতে সে যতটা মনোযোগী, পড়াশোনায় ঠিক ততটা অমনোযোগী। এমন কি বাৎসরিক পরীড়্গার সময়ও তিনি পড়াশোনা করতেন না। কিন্তু পরীড়্গায় পাস ঠিকই করতেন। বাবা ছেলেকে নানা রকমভাবে বুঝাতেন কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দিতেন না। তার বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন পিতা গুরম্ন প্রসাদ সেন কৃষ্ণনগরে সাব-জজ। কৃষ্ণনগরে গুরম্ন প্রসাদের স্বাস্থ্যের খুব অবনতি হয় তাই ভ্রাতুস্পুত্রদের পরামর্শে স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দু'বৎসর পর বড় ভাইপো বরদা গোবিন্দ কলেরা রোগে মারা যান। ছোট ভাই কালী কুমার বড় ভাইয়ের অকাল মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহ ত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় গুরম্ন প্রসাদ সেন বাকশূন্য-দিক হারা হয়ে পড়েন। গুরম্ন প্রসাদের ছোট ছেলে অর্থাৎ রজনীকান্থর ছোট ভাই ক্ষিপ্ত কুকুরের কামড়ে পরলোকে গমন করেন। ঠিক এই সময় থেকে এই সংসারে নানারকম বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। পর পর এতগুলো মৃত্যু গুরু প্রসাদের মনে গভীর শোকের ছায়া ফেলে।

রজনীকান্থ খুব মেধাবী ছিল। গ্রন্থকিট না হয়েও স্কুল জীবন থেকে বি.এ পর্যন্থ ভালোভাবেই পাস করেন। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রজনীকান্থ এনট্রান্স পাস করে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাস করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে রজনীকান্থ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন এবং আইন পড়ার জন্য সিটি কলেজেই ভর্তি হন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে বি.এল পরীড়্গায় পাস করেন। বি.এল পাস করেই রজনীকান্থ রাজশাহীতে ওকালতি শুরম্ন করেন। স্ত্রী, সঙ্গে নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ভাল সুনাম করে ফেললেন। পারিবারিক সূত্র তাকে এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ওকালতির অবসরে গান করা এবং লেখা তার দ্বিতীয় প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় সিরাজগঞ্জের উকিল কুঞ্জুবিহারী দে-র সাথে রজনীকান্থের পরিচয় হয় এবং রজনীকান্থ যে ভালো গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী সে কথা জানতে পারেন। কুঞ্জু বাবু তার পেশার পাশাপাশি 'আশালতা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। একদিন কুঞ্জু বাবু রজনীকান্থকে তার পত্রিকার জন্য একটি কবিতা চাইলে রজনীকান্থ তাকে 'আশা' নামে একটি কবিতা পাঠান এবং কুঞ্জু বাবুর 'আশালতা' পত্রিকায় তা ছাপা হয়। এই 'আশা' নামের কবিতাটিই রজনীকান্থর প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

কবিতাটি প্রকাশের পর তৎকালীন লেখক-পাঠকদের মধ্যে বেশ আলোচিত হয়। শুধু কবিতা ছাপিয়েই রজনীকান্থ প্রখ্যাত হলেন না। রাজশাহী থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজার পাট করে রজনীকান্থ খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। রজনীকান্থ যে একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা তা সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকলো। এরপর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় এবং তার সুমধুর কণ্ঠে গাওয়া গানগুলো শ্রোতা-দর্শকদের অভিভূত করে ফেলেন। ফলশ্রম্নতিতে তিনি সকলের কাছে একজন বলিষ্ঠ অভিনেতা ও গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। রজনীকান্থ বিভিন্ন ড়্গেত্রে যখন জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকেন তখন তার দাদা উমাশঙ্কর গলার ক্যান্সারে মারা গেলেন। রজনীকান্থর সংসারে আরও এক বিপর্যয় এলো। সারা সংসার এখন তার উপরে।

তথ্য পাঠে জানা যায় রজনীকা~ত্ম এফএ পড়ার সময় অবশ্য পাঠ্যরূপে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েছিলেন আর সে কারণে এই বিষয় সংক্রা~ত্ম কিছু যন্ত্রপাতিও ক্রয় করেছিলেন। ছুটিতে যখনই রাজশাহী থেকে ভাঙাবাড়ি যেতেন তখন যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং গ্রামের উৎসাহী কৃতী ছাত্রদের বিজ্ঞানের গূঢ় এবং নিরস তত্ত্বগুলো সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। এ ছাড়া উদ্ভিদবিজ্ঞানের নানা কথা ও নানা জাতীয় গাছপালা, ফলমূল, শাক-সবজি ঔষধাদির গুণাগুণ নিয়েও তাদের জ্ঞানদান করতেন। মাঝে মাঝে তিনি গ্রামের স্কুলে হাজির হয়ে ক্লাসে গিয়েও ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে শিড়্গা দিতেন। শুধু তাই নয় নারী শিড়্গা দেবার জন্য প্রথমে তিনি তার স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়ে গ্রামে নারী শিড়্গার প্রচলন করেন। তার ছোট বোন অম্বুজা দেবীও তার ভাইয়ের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর সাথে যোগ দিয়ে নারী শিড়্গার প্রচলন শুরু করেন ও নারী সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য শ্রম দিতে থাকেন। রজনীকা~ত্মর স্ত্রী, হিরন্ময়ী দেবী ছোট বোন অম্বুজা দাশ গুপ্তাকে উৎসাহ দান ও নানা তথ্যদানে তাদের কাজের অগ্রগতি করতে থাকেন।

আমরা জানি, কা~ত্মকবি রজনীকা~ত্ম সেন বাংলাদেশের সঙ্গীত ড়্গেত্রে পঞ্চ-রত্নের একজন। এই পঞ্চ-রত্নের পরিচয় দিতে গেলে এভাবে বলা হয়- (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, (৩) অতুল প্রসাদ সেন, (৪) রজনীকা~ত্ম সেন এবং (৫) কাজী নজরম্নল ইসলাম। এদের প্রত্যেকের সঙ্গীত ড়্গেত্রের বিষয় বিশেস্নষণ করতে গেলে জানা যায়, সবারই প্রথাগত সঙ্গীতশিড়্গা কমবেশী আছে কিন্' রজনীকা~ত্মর কোন প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষা আছে বলে জানা যায় নাই। আমরা জানি সঙ্গীত গুরম্নমুখী বিদ্যা। রজনীকা~ত্মর কোন গুরম্ন ছিল কি না তা তার জীবনী পাঠে আমি জানতে পারিনি। তবে বংশগতভাবে পিতা-মাতা সবাই ধর্মীয় গান গাইতেন এবং কথকতা পাঠ করতেন। বাল্যকাল থেকেই রজনীকা~ত্ম এ সব গান শোনামাত্র কণ্ঠস্থ করে নিতেন এবং তার সুরেলা কণ্ঠে সারা দিনমান গাইতেন। কোন গানের পংক্তি মনে না থাকলে নিজে তৈরি করে ঐ সুরে গাইতেন। রজনীকা~ত্ম সঙ্গীতের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা করেছিলেন এমন কোন তথ্য কোথাও না পেলেও গানের শীর্ষে রাগ ও তালের নির্দেশই প্রমাণ করে রাগ-রাগিনী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল। তবে, সম্প্রতি প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক 'পার্থ বসু' শারদ অর্ঘ্য পত্রিকায় (১৩৯৫) এক লেখায় রজনীকা~ত্মর সঙ্গীতে বাল্যকাল থেকেই তালিম ছিল বলে উলেস্নখ করেছেন। বিষয়টি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য, কেননা রজনীকা~ত্ম গান লিখেই তাৎক্ষণিকভাবে সুর ও রাগ নির্দেশ করে দিতেন। কোন এক সময় এক মাঝির কণ্ঠে গান শুনে মোহিত হয়ে যান এবং মাঝির কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন গানটি কাঙ্গাল হরিণাথের। গানটির বাণী নিম্নে কিছুটা প্রকাশ করা হলোঃ

গান

ওহে, দিনতো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা, ডাকছি হে, তোমারে।
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
ওহে, আমায় কি পার করবে না হে, আমায় অধম বলে,
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে।
যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল
তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে
আমি সাধনহীন তাই রইলাম পড়ে হে
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকুর পরপারে ।।

তথ্য আলোচনায় জানা যায়, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্তের প্রথম গীতিকাব্য 'বাণী' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রেক্ষিতে কিছু কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। বন্ধুবর অক্ষয় কুমার মৈত্র সব সময় রজনীকান্তকে বলতেন তার গান ও কবিতাগুলো দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য, কিন্তু রজনীকান্ত কিছুতেই রাজী হতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন সমাজপতি থাকলে আর রক্ষে থাকবে না। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' গ্রন্থটি প্রকাশের পর দ্বিজেন্দ্র লাল এর তীর্যক আলোচনায় মুখোর হয়ে পড়েছিলেন। তাতেই তার দ্বিধা যে, তার 'বাণী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সুরেশ চন্দ্র সমাজপতির কড়া সমালোচনার মুখে তাকে পড়তে হবে। এ কথা জানার পর অক্ষয় কুমার মৈত্র একদিন তার বাসায় সমাজপতিকে নিমন্ত্রণ করে রজনীকান্তের গান শোনাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। রজনীকান্তের গান শুনে সমাজপতি মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করতে থাকেন। এরপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্তের 'বাণী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। আরো কিছু নতুন কবিতা ও গান যুক্ত করে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে এবং গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়। রজনীকান্তের মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৮টি। নিম্নে তা দেয়া হলোঃ

১। 'বাণী' (কাব্য) প্রকাশকাল ২৪-০৮-১৯০২ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮২

২। 'কল্যাণী' (কাব্য) প্রকাশকাল ১৯০৫

৩। 'অমৃত' (নীতি কবিতা) প্রকাশকাল ২৪-০৫-১৯১০

৪। 'আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয় সঙ্গীত) প্রকাশকাল ০৫-১০-১৯১০, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৬

৫। 'বিশ্রাম' (কাব্য) প্রকাশকাল ১০-১০-১৯১০ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৭

৬। 'অভয়া' (কাব্য) প্রকাশকাল ০৫-১১-১৯১০ পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০১

৭। 'সদ্ভাব-কুসুম' (নীতি কবিতা) প্রকাশকাল ৩১-০৫-১৯১৩ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৭

৮। 'শেষদান' (কাব্য) প্রকাশকাল ১৯২৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৩

প্রখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক পার্থ বসু রজনীকান্ত সেন রচিত বাংলা কাব্য সঙ্গীতের রূপ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তার ভাষায়। আমি তার কথাগুলো পাঠকদের জন্য তুলে দিলাম। (এইচএমভির 'শারদ অর্ঘ্য' (১৩৯৫) পূজার গান, পৃষ্ঠা-১৭):

'রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাহিত্য ও সংগীতরসিক পরিবারে। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ব্রজবুলি ভাষায় কীর্তন সংগ্রহ 'পদাবলী মণিমালা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রজনীকান্ত আযৌবন দাবা, হারমোনিয়ম, তাস, ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তবে পেশা ছিল ওকালতি। কিন্তু একান্তভাবে আশৈশব সংগীতচর্চা ছিল তাঁর জীবনধর্ম। রাজশাহীতে বাসকালে অক্ষয় কুমার মৈত্রের আগ্রহে রজনীকান্তের জীবৎকালে মাত্র দু'টি গ্রন্থ 'বাণী' ও 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে দ্বিজেন্দ্র লালের কণ্ঠে হাসির গান শুনে হাস্যরসাত্মক গান রচনায়ও রজনীকান্ত উৎসাহ পেয়েছিলে। স্বভাবে-চরিত্রে সরল, সহৃদয় এই প্রতিভাবান কবির নিজস্ব রচনা-মুদ্রণে সহজাত সংকোচ ছিল। রজনীকান্তের গানেও তাঁর সেই কবি চরিত্রই প্রতিভাত হয়েছে। কথা ও সুরের নিপুণ মিলনের মধ্যেও রজনীকান্তের গানের মৌল ধর্ম হল প্রার্থনা এবং অভিমান, বিশ্বাস আর বিষাদ। মৃত্যু যখন অদূরে অপেক্ষামাণ তখন দীর্ণকণ্ঠে সীমিতবাক রজনীকান্তকে দেখে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন, 'কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।ঃ ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন, আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।' আসলে রজনীকান্তের কাছে গান নিছক শিল্প সৃষ্টি ছিল না, তাঁর জীবনধারণের প্রতিদিনের একমাত্র উপকরণ, প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করে এক অপরাজেয় হৃদয়ের নম্র প্রকাশ রজনীকান্তের গান। চিরকালের

সংগীতরস-পিয়াসী শ্রোতার কাছে সেই গান এই কারণে অতীব অন্তরঙ্গ এক সম্পদ বাংলা সংস্কৃতির সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং উজ্জ্বল ঐশ্বর্য।

রজনীকান্ত রচিত গানগুলোতে শাক্ত ভাবই প্রধান, তা ছাড়া হাসির গানও তিনি কিছু রচনা করেছেন। সবগুলো গানের শীর্ষে রাগ ও তালের নির্দেশ দেয়া আছে। প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষা না থাকলেও সঙ্গীতের জ্ঞান তার ছিল এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। নিম্নে তার রচিত ও সুরারোপিত রেকর্ডকৃত গানের একটি তালিকা দেয়া হলো। রজনীকান্তের গানে একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে তা বেশ বোঝা যায়।

১৩১৩ সালে আশ্বিন মাসে প্রথম রজনীকান্ত অসুস্থবোধ করলেন। স্থানীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা করালেন কিন্তু কোন ফল হল না। অন্য উপায় না দেখে তিনি সপরিবারে চিকিৎসার জন্য কোলকাতা গমন করে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করলেন। কোলকাতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানায় তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। কিছুতেই সেরে উঠছিলেন না। ডাক্তারের পরামর্শে রজনীকান্ত একটি নৌকা ভাড়া করে এক মাস পদ্মায় ভাসতে থাকেন। কিন্তু এতেও স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসক পুনরায় তাকে কটকে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি কটকে যাওয়া স্থির করলেন। কটক মহানন্দা ও কাটজুড়ি নদীর সঙ্গমস্থল। এতবড় অসুস্থতার মধ্যেও রজনীকান্ত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও কাঙ্গাল হরিনাথের গান শুনলে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারতেন না গুণ গুণ করে সুর ভাজতে থাকতেন। কটকে যাবার পর রজনীকান্ত সুস্থবোধ করতে লাগলেন এবং মনেও তার স্ফূর্তির লক্ষ্মণ দেখা গেল। তাই পুনরায় রাজশাহী ফিরে গেলেন কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পরপরই পুনরায় ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মনোবল হারাতে থাকলেন। নিজের জীবনের প্রতিও কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। এদিকে সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য কোন গচ্ছিত অর্থও নেই, তাই হতাশা তাকে যেন পেয়ে বসলো। স্বাস্থ্য ভালো করার আশায় এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে, হোমিওপ্যাথি, তারপর কবিরাজী কোনটাই বাদ গেল না। কিন্তু রজনীকান্ত তার ভগ্নস্বাস্থ্য আর উদ্ধার করতে পারলেন না।

বেশ কিছুদিন থেকেই রজনীকান্ত অসুস্থ ছিলেন। বিদেশী ডাক্তার ওকেনলি তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তার গলায় ক্যান্সার হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। কাশিতে এক অবধূত চিকিৎসক বালাজী মহারাজের কথা জানতে পেরে কাশিতে গিয়েও বেশ কয়েক মাস চিকিৎসা করান কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় পুনরায় কোলকাতা ফিরে আসেন। প্রায় তিন বৎসর কোলকতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। খুবই অসুস্থ হওয়ায় রেসিডেন্ট সার্জন ক্যাপ্টেন ডেনহাম হোয়াইট ২৮শে মাঘ বৃহস্পতিবার দুপুর বারটায় তার কণ্ঠদেশে ট্রাকিওয়াটমি অস্ত্রোপচার করে শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের ব্যবস্থার জন্য ছিদ্র করে দেন। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তার প্রাণরক্ষা হলো বটে কিন্তু জন্মের মতো কথা বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলা বন্ধ হলে তিনি লিখে তার অবস্থার কথা জানাতেন, সেই মতো চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি চলত।

দীর্ঘদিন রোগে ভুগে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র) মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার সময় এই প্রথিতযশা জনপ্রিয় কবি ও কণ্ঠশিল্পী পৃথিবীর সকলের মায়া ছেড়ে অমর সুরলোকে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র, তিন কন্যা, বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে রেখে যান। রজনীকান্তের জীবদ্দশায় তার গানের তেমন রেকর্ড প্রকাশ হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর পর রজনীকান্তের গান প্রথম বাণিজ্যিক রেকর্ড করেন শিল্পী রাধাচরণ ভট্টাচার্য। গানে প্রথম চরণ যথাক্রমেঃ (১) তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায়ে, রেকর্ডের অপর পিঠের গানটি ছিল (২) মনরে বল না যদি গাবে গান। রেকর্ড নম্বর পি-৮৫৬।

এরপর বিশের দশকেই যত রেকর্ড বাজারজাত করা হয়েছে তাদের শিল্পীরা ছিলেন, যথাক্রমেঃ (১)

কে, মল্লিক, (২) এম,এন, ঘোষ, (৩) বিজয় লাল মুখোপাধ্যায়, (৪) ড়িগরোদ গোপাল মুখার্জি, (৫) মানদা সুন্দরী দাসী, (৬) ডাঃ জীবানন্দ গোস্বামী, (৭) লাল চাদ বড়াল, (৮) শোভনা দেবী, (৯) অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় (১০) মিস্ ইন্দু বালা এবং (১১) মিস্ আমোদিনী। এরা সবাই ঐ সময়ের নামকরা শিল্পী হিসেবে বাজারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ গানগুলো প্রকাশিত হয় এইচ, এম,ভি রেকর্ড কোম্পানী থেকে।

তাছাড়া একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় জেনোফোন রেকর্ড থেকে। শিল্পী ছিলেন মিস্ ভট্টাচার্য। জেনোফোন রেকর্ড নম্বর এ-৮৬০। এ সব রেকর্ডের প্রকাশকাল জানা যায়নি তবে এগুলোর ক্রমিক রেকর্ড নম্বর থেকে অনুমান করা যায় বিশের দশকের দিকে রেকর্ডগুলো প্রকাশিত। রজনীকান্তর জীবদ্দশাতে তার কোন গান গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। নিম্নে যেসব ক্যাসেট, এলপিতে রজনীকান্তের গান এইচএমভি থেকে বাজারজাত করা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ শিল্পীর কণ্ঠে কি কি গান গীত হয়েছে তার একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

১। Song of Rajanikanta vol-1EM1, EALP 1392, 1973.

শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যুথিকা রায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, অর্ঘ্য সেন, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকাঃ রাজ্যেশ্বর মিত্র।

সংকলিত গানঃ ঐ বধির যবনিকা/কেতন বঞ্চিত হব চরণে/আমি সকল কাজের পাই যে সময়/আহা কত অপরাধ করেছি/কুটিল কুপথ ধরিয়া তুমি অরূপ স্বরূপ/পাতকী বলিয়ে কি গো/ কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব/হরি প্রেম-গগনে চির রাখ/তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে/ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়/ আমি তো তোমারে চাহিনি দয়াময়।

২। Song of Rajanikanta vol-2EM1, ECSD. 2530, 1976

শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, গীতা মাইতি, নিশীথ সাধু এবং নীলা মজুমদার।

সংকলিত গানঃ আমি অকৃতি অধম/জাগাও পথিকে ও সে ঘুমে অচেতন/আমায় সকল রকমে কাঙাল করিয়া/তারা মোরে রেখেছিল আমি দেখেছি জীবন ভবে/পূর্ণ জ্যোতি তুমি/কে রে হৃদয়ে জাগে/প্রেমে জল হয়ে যাও/যেখানে সে দয়াল আমার/কত ভাবে বিরাজিছ/কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো/তুমি অন্তহীন বিরাট/ধীরে সমীরে/যদি মরমে লুকায়ে রবে/ওমা কোলের ছেলে/দেখ দেখি নয়ন মুদে।

৩। মা আমার আনন্দময়ী-রজনীকান্তের ভক্তিমূলক গান EMI-PSLP 1528, 1985

শিল্পীঃ গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত গানঃ বিশ্ববিপদ ভঞ্জন/সখা, তোমারে পাইলে/পাপ বাসনা রে, হরিবল/আর কতদিন ভবে থাকিব মা/লোকে বলিত তুমি আছ/তুমি আমার অন্তকালের খবর জান/(এই) ক্ষুদ্র-হৃদয় পল্লব জল/মা আমার আনন্দময়ী/তোমারই দেওয়া প্রাণে/ঐ রবি ডুবু ডুবু/যদি, প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ/সাধুর চিতে তুমি আনন্দরূপে রাজ/এই দেহটা তো নইরে আমি/মন তুই ভুল করেছিস মূলে/মা আমায় পাগল করবি কবে/আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে।

ভূমিকাঃ গৌরকিশোর ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালনাঃ দিলীপ কুমার রায়।

৪। EMI ECSD 41559

শিল্পীঃ কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালকঃ ভি বালসারা

ভূমিকাঃ শান্তিলতা দেবী

সংকলিত গানঃ সখিরে, মরম পরশে তারি গান/আমায় ডেকে ডেকে ফিরে গেছে মা/পাতকী বলিয়ে কি গো/ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে/মাগো-আমার সকলি ভ্রান্তি/বেলা যে ফুরায়ে যায়/ বুঝি পোহাল না পাতক রজনী/শুনাও তোমার অমৃতবাণী/আমি দেখেছি জীবনভর চাহিয়া কত/অনন্ত-দিগন্তব্যাপী অনন্ত মহিমা তব/আমায় অভাবে রেখেছ যদি হরি হে/ধীরে মোর টেনে লহ তোমার কোলে/তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব।

রেকর্ড সঙ্গীত

রেকর্ড সঙ্গীত (১৯২৭) পরিবেশিত তালিকা অনুযায়ী।

গানের প্রথম কলি রেকর্ড নম্বর শিল্পী

আমি তো তোমার চাহিনি পি.৪৩০২ কে, মলিস্নক

আমি সকল কাজের পি. ৪০৬১ এম,এন ঘোষ

মা আমায় পাগল করবি কবে পি. ৬২৭৪ বিজয় লাল মুখোপাধ্যায়

আর কি আমায় দিতে পারে পি. ৬৪২১ ড্বিগরোদ গোপাল মুখার্জি

আর কাহারো কাছে যাবো না আমি পি. ৩৫৭৩ মানদাসুন্দরী দাসী

কবে তৃষিত এ মরম্ন পি. ২১৫৯ ডাঃ জীবানন্দ গোস্বামী

কেন বঞ্চিত হব চরণে পি. ৪৭২৭ লালচাঁদ বড়াল

গা তোল গা তোল পি. ৬৯২৮ কে. মলিস্নক

মন রে বল না যদি গাবে গান পি. ৮৫৬ রাধাচরণ ভট্টাচার্য

তারে দেখবি যদি পি. ২৩৩৬ ডাঃ জীবানন্দ গোস্বামী

পাতকী বলিয়ে কি গো পি. ২১৫৯ ডাঃ জীবানন্দ গোস্বামী

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে পি. ৫৮২০ এম.এন. ঘোষ

মাগো আমার সকলই ভ্রান্তি পি. ৭৪০৯ শোভনা দেবী

সখিরে মরমে পরশে তারি গান পি. ৪১১৭ মানদাসুন্দরী দাসী

সেথা আমি কি গাহিব পি. ৪০৮৪ মানদাসুন্দরী দাসী

তোমরা ও আমরা পি. ৪৩৮৭ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়

তুমি নির্মল কর পি. ৮৫৬ রাধাচরণ ভট্টাচার্য

সকল রকমে কাঙাল করেছ পি. ৫৫৯৩ কে. মল্লিক

কেন কুণ্ঠিত হব যতনে? পি. ৫৫৯৩ কে. মলিস্নক

আহা কত অপরাধ করেছি আমি? পি. ৬১৭০ মিস্ ইন্দুবালা (এমেচার)

মায়ের চরণ তলে ঠাঁই লব পি. ৬১৭০ মিস্ ইন্দুবালা

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা পি. ৭১৮৪ মিস আমোদিনী

আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি পি. ৭১৮৪ মিস আমোদিনী

মম সুখোদয় যেদিন উদয় হবে গো পি. ৪৭২৭ এম.এন ঘোষ (ওরফে মন্টা)

জেনোফোন রেকর্ড

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব এ-৮৬০ মিস ভট্টাচার্য

রজনীকান্ত কেবলমাত্র গীতি কবি ও শিল্পীর মধ্যেই জীবন সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমরা তার দেশপ্রেমের মহান দীড়্গার পরিচয় পাই। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দৃপ্ত এই কবিও অন্যান্য সবার মত আন্দোলনের কাতারে নিজেকে শামিল করেছিলেন। রজনীকান্তের প্রায় সব গানেই শাক্ত প্রভাব বিশেষ করে মানবতাবাদ স্পষ্ট হয়েছে জোরালোভাবেই। এ অর্থে তাকে মানবতাবাদী কবি বলাই অধিক শ্রেয়। পেশায় আইন ব্যবসায়ী হলেও তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি এবং মানবধর্ম চর্চা করতেন মনেপ্রাণে। গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদের শিড়্গায় তাঁর মনোযোগই প্রমাণ করে, দেশ এবং দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতি তার আত্মিক টান কতটা প্রবল। রজনীকান্ত সমাজ সভ্যতার পশ্চাদপদতা নিয়ে ভাবতেন বলেই নিজের বাড়ীতে পোস্ট অফিস স্থাপন করেছিলেন। আজকের বিশ্বসঙ্গীতে বাংলা গানের যে শক্ত অবস্থান সে কথা অস্বীকার করবার ঔদ্ধত্য কারো নেই। লালন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের গান পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সঙ্গীত রসিকদের মনপ্রাণ সিক্ত করে আছে। স্বল্পপরিসরে হলেও রজনীকান্তও পাশাপাশি অবস্থানের দাবিদার। রজনীকান্ত বাংলা গানের অমূল্য সম্পদ। রজনীকান্তকে নিয়ে তেমন লেখালেখি হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের উচিত বেশী করে রজনীকান্তকে জানা এবং বিশ্ব দরবারে তার সঙ্গীতকে পরিচিত করে তোলা। আমার বিশ্বাস, রজনীকান্ত বিশ্বসঙ্গীতে বাঙালির আর এক নতুন বিষ্ময় প্রতিভার সংযোজন হয়ে উঠতে পারেন অনায়াসে।

তথ্য সূত্রঃ

১। বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত সেন, সুনিলময় ঘোষ, অর্পনা বুক ডিস্টিবিউটার্স, কোলকাতা, ১৯৯৯

২। রজনীকান্ত সেন, আসাদ চৌধুরী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

আসাদুল হক, ঢাকা